এলাহাবাদ অধিবেশনে ইকবালের ঐতিহাসিক ভাষণ

মুহাম্মদ ইকবাল

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

ইকবালের এলাহাবাদের এই ঐতিহাসিক ভাষণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের দার্শনিক ও রাজনৈতিক বয়ান হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তান ধারণা বিনির্মাণে ইসলামের ভূমিকা এবং নয়া রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের সম্পর্ক কি হবে তা নিয়ে ইকবালের প্রস্তাব ও পর্যালোচনা রয়েছে এই ভাষণে। ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষতবাদ আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও আধিপত্যবাদের বিপরীতে ইকবাল মুসলিম জাতীয়তাবাদের যে প্রস্তাবনা পেশ করেছেন তা আজো প্রাসঙ্গিক। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিমন্ডলে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও আদর্শিক সংকটের প্রেক্ষিতে সঞ্চারণ এই ঐতিহাসিক ভাষণটি পাঠকের জন্য সংশোধিত ও পরিমার্জিত আকারে পুনঃপ্রকাশ করেছে। - সম্পাদক

[১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশনে আল্লামা ইকবালের প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ]

সুধীমন্ডলী, ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের সর্বাধিক সংকট-সন্ধিক্ষণে আপনারা নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য আমাকে আহবান করে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। নিঃসন্দেহে এই বিরাট জনসমাবেশে এমন বহু লোক আছেন, যাঁরা আমার চেয়ে বহুগুণে অধিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং যাঁদের রাজনীতি জ্ঞানের প্রতি আমি উচ্চতম শ্রদ্ধা পোষণ করি। সুতরাং আজকের এই জনসমাবেশ যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আহুত হয়েছে, তৎসম্পর্কে আমি কোনো নির্দেশ দেবার দাবী করলে তা প্রগলভতার শামিল হবে। আমি কোনো দলের নেতা নই; কোনো নেতার অনুসরণ আমি করি না। আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় করেছি ইসলামের সযত্ন অধ্যয়নে – ইসলামের কানুন ও রাষ্টব্যবস্থা, তার তমদ্দুন, তার ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়নে। আমার মনে হয়, ইসলামের প্রাণবস্তুর সাথে এই অবিরাম সংযোগের ফলে তা আমার উপলব্ধিতে যেভাবে প্রকাশ লাভ করেছে, তার ফলে বিশ্বজনীন সত্য হিসাবে ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে আমি এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টির অধিকার লাভ করেছি। তার মূল্য যাই হোক, এরই পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতের মুসলিম জনগণ ইসলামের প্রাণবস্তুর প্রতি সত্যিকারভাবে আস্থশীল থাকতে দৃঢ় সংকল্প ধরে নিয়ে, আমি আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নির্দেশনা দিব না বরং আমার মতে যেসব মূলনীতি দ্বারা সেসব সিদ্ধান্তের সাধারণ প্রকৃতি নির্ধারিত হবে তা সুস্পষ্টভাবে আপনাদের উপলব্ধিতে আনার ক্ষুদ্র চেষ্টা করবো।

১। ইসলাম এবং জাতীয়তাবাদ

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একটি নৈতিক আদর্শ ও বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে ইসলামই ভারতের মুসলিম জনগণের জীবন-ইতিহাস প্রধান গঠনমূলক উপাদান হয়ে আছে। বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে আমি বুঝি আইনসংক্রান্ত একটি বিশেষ ধারা নিয়ন্ত্রিত ও একটি সুনির্দিষ্ট নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত সামাজিক কাঠামো। তা থেকে এমন সব মৌলিক আবেগ ও আনুগত্য জন্ম নিয়েছে, যা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এক সুনির্দিষ্ট জাতিতে পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে একথা বললে মোটেই অতিরঞ্জন হবে না যে, সম্ভবতঃ ভারতই দুনিয়ার একমাত্র দেশ, যেখানে ইসলাম জাতিগঠনকারী শক্তি হিসাবে সব চাইতে বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও সমাজ হিসাবে ইসলামের কাঠামো প্রায় সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠেছে সুনির্দিষ্ট নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত তমদ্দুন হিসাবে ইসলামের কার্যকারিতার মাধ্যমে। আমার বক্তব্য

হচ্ছে এই যে, মুসলিম সমাজ বলতে যা দেখি তা ইসলামী তমদ্দুনের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানের চাপেই তার উল্লেখযোগ্য সমজাতীয়তা (homogeneity) ও অভ্যন্তরীণ ঐক্যসহকারে রূপ লাভ করেছে।

অবশ্য ইউরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে ধারণাসমূহ প্রকাশ লাভ করছে, তাতে ভারত ও ভারতের বাইরের বর্তমান যুগের মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। এইসব ধারণায় অনুপ্রাণিত আমাদের সমাজের তরুণতর লোকেরা ইউরোপের এসব চিন্তাধারার বিবর্তনের শেকড়ে যেসব বাস্তবতা কাজ করেছে তার সমালোচনামূলক উপলব্ধি ব্যতীতই সেসব ধারণাকে নিজ নিজ দেশে জীবন্ত শক্তি (living force) হিসাবে দেখবার জন্য আগ্রহী। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম বলতে বুঝাতো একটা নিছক সন্যাস-আশ্রম-আশ্রয়ী বিধানকে (Monastic Order), যা ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করেছে এক বিরাট গির্জা প্রতিষ্ঠানে। লুথারের প্রতিবাদ অভিযান চালিত হয়েছিলো গির্জা-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, পার্থিব ধরনের কোনো রাষ্ট্র বিধানের বিরুদ্ধে নয় এবং তার সুস্পষ্ট কারণ ছিলো এই যে, খৃষ্টধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট তেমন কোনো রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার অস্তিত্বই ছিলো না। এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লুথারের বিদ্রোহ করার যৌক্তিকতাও পুরোপুরিই ছিলো; যদিও আমার মনে হয়, তিনি তখন এ সত্য উপলব্ধি করেন নি যে, ইউরোপের তখনকার চলতি অবস্থায় তার বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত বহুবিধ জাতীয় তথা সংকীর্ণতর নৈতিক পদ্ধতির জন্ম দিয়ে যিশুর বিশ্বজনীন নীতিবাদকে বিপর্যস্ত করবে। এমনি করে রুশো ও লুথারের ন্যায় ব্যক্তিদের উদ্যাগে চালিত বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত আন্দোলনের অভ্যুত্থানের ফল হলো একককে পরস্পর সমন্বয়হীন বহুতে পরিণত করা (Mutually Ill-adjusted many), মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তর এবং তার বাহন হিসাবে প্রয়োজন হলো দেশের ধারণার মতো অধিকতর বাস্তবিক ভিত্তির এবং তা বিকাশ লাভ করতে লাগলো জাতীয় ধারায় উদ্ভূত বিভিন্ন রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির মাধ্যমে। জাতীয় ধারার অর্থ হলো: যে ধারায় অঞ্চলকে স্বীকার করা হয় রাজনৈতিক সংহতির একমাত্র নীতি হিসাবে। আপনারা যদি ধর্মসংক্রান্ত ধারণাকে সুম্পূর্ণরূপে পারলৌকিক ব্যাপার বলে বিবেচনা করতে শুরু করেন, তাহলে ইউরোপের খৃষ্টধর্মের যে পরিণতি হয়েছে, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নীতিবাদ ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার জাতীয় পদ্ধতি দ্বারা যিশুর বিশ্বজনীন নীতিবাদ বিপর্যস্ত হয়েছে। ফলে ইউরোপ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছে, তা হচ্ছে: ধর্ম হলো ব্যক্তিবিশেষের ঘরোয়া ব্যাপার এবং মানুষের জীবনের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

ইসলাম মানুষের একত্বকে (Unity) আত্মা ও বস্তুর সমন্বয়াতীত দ্বৈতবাদে (Duality) বিভক্ত করে না। ইসলামে আল্লাহ ও বিশ্বপ্রক্রিয়া, আত্মা ও বস্তু, উপাসনাগার ও রাষ্ট্র পরস্পরের পরিপূরক। মানুষ অন্যত্র অবস্থিত আত্মিক জগতের খাতিরে উপেক্ষণীয় এক অপবিত্র জগতের বাসিন্দা নয়। ইসলামের কাছে বস্তু হচ্ছে এমন আত্মা যা স্থান ও কালের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। ইউরোপ সম্ভবতঃ ম্যানিকিয়ান চিন্তাধারা (Manichaean Thought) থেকে আত্মা ও বস্তুর দ্বান্দ্বিক মতবাদকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলো। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়গকগণ আজ শুরুর দিককার এই ভ্রান্তি উপলব্ধি করছেন, কিন্তু তাদের রাজনীতিকরা পরোক্ষভাবে দুনিয়াকে বাধ্য করছেন তাকে প্রশ্নাতীত মতবাদ বলে স্বীকার করে নিতে। আত্মিক ও পার্থিবের মধ্যে এই ভ্রান্তিমূলক বিভেদ সৃষ্টি ইউরোপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে তার ফল হয়েছে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-জীবন থেকে খৃষ্টধর্মের পূর্ণ নির্বাসন। এর ফলে গড়ে উঠেছে মানবীয় স্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত পরস্পর সামঞ্জস্যহীন (Ill-adjusted) রাষ্ট্রগোষ্ঠি। এই পরস্পর সামঞ্জস্যহীন রাষ্ট্রগোষ্ঠি খৃষ্টধর্মের নীতি ও বিশ্বাসসমূহকে পদদলিত করার পর আজ প্রয়োজন অনুভব করছে এক ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের, অর্থাৎ সেই ঐক্যের প্রয়োজনই সে অনুভব করছে, যা খৃষ্টীয় গির্জা-প্রতিষ্ঠান বুনিয়াদীভাবে তাদেরকে দান করেছিলো, অথচ খৃষ্টের মানব-ভ্রাতৃত্বের আলোকে তার সংস্কার সাধনের পরিবর্তে লুথারের প্রেরণায় তারা তা ধবংস করাকেই যথার্থ মনে করেছিল।

ইসলামী দুনিয়ায় একজন লুথার একটি অসম্ভব ব্যাপার; কারণ এখানে মধ্যযুগীয় খৃষ্টধর্মের অনুরূপ কোনো গির্জা-প্রতিষ্ঠান নেই, যার জন্য কোনো ধ্বংসকারীর প্রয়োজন হতে পারে। ইসলামী জাহানে আমাদের রয়েছে এক বিশ্বজনীন রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা যার মৌলিক বিষয়াদি নাজিল করা হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি, তবে আধুনিক দুনিয়ার সাথে ফকিহদের সংস্পর্শের অভাবে তার কাঠামোগত দিকগুলোতে নতুনতর শক্তি সঞ্চার করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইসলামী জাহানে জাতীয় (national) ধারণার চূড়ান্ত ভাগ্য কি হবে, তা আমি বলতে পারি না। ইসলাম ইতিপূর্বে ভিন্ন ভাবধারা-প্রকাশক বহু ধারণাকে যেমন আত্মস্ত করে নতুন রূপদান করেছে এক্ষেত্রেও তেমনি কিছু হবে নাকি তার নিজস্ব শক্তি দিয়ে এর আমূল পরিবর্তন সাধন করবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা কঠিন। সেদিন লিডেনের (হল্যান্ড) অধ্যাপক ওয়েনসিংক আমার কাছে লিখেছেন: It seems to me that Islam is entering upon a crisis through which Christianity has been passing for more than a century. The great difficulty is how to save the foundations of religion when many antiquated notions have to be given up. It seems to me scarcely possible to state what the outcome will be for Christianity, still less what it will be for Islam. আমার মনে হয়, খৃষ্টধর্ম গত এক শতকের অধিককাল যে সংকট অতিক্রম কর চলেছে, ইসলামও তেমনি এক সংকট-পরিস্থিতিতে প্রবেশ করছে। একদিকে যেমন বহু প্রাচীন ধারণাকে উচ্ছেদ করবার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি কি করে ধর্মের বুনিয়াদ বাঁচিয়ে রাখা যাবে, সেটাই হচ্ছে এক জটিল সমস্যা। খৃষ্টধর্মের জন্য কি পরিণাম প্রতীক্ষা করছে,

তা বলা আমার পক্ষে কদাচিত সম্ভব, আরো কম সম্ভব হচ্ছে ইসলামের পরিণাম নির্ধারণ করা।” বর্তমান মুহূর্তে জাতীয় ধারণা (National Idea) মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিকে গোষ্ঠিকেন্দ্রিক করে তুলেছে এবং এমনি করে বাস্তবক্ষেত্রে ইসলামের মানবীয় কার্যকলাপের গতি রুদ্ধ করছে। এই গোষ্ঠি-চেতনার (Racial Consciousness) বিকাশের ফলে অন্যতর মানদন্ডের বিকাশ গঠতে পারে এবং এমনকি, তা ইসলামী মানদন্ডের সাথে সাংঘর্ষিক কিছুও হতে পারে।

আশা করি, আমার এই বাহ্যত একাডেমিক আলোচনার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে ভাষণ দান করার জন্য আপনারা এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন যে ব্যক্তি ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা থেকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে মুক্ত করার জন্য জীবন্ত শক্তি হিসাবে ইসলামের ব্যাপারে হতাশাবাদী নয়, ধর্ম ব্যক্তি ও রাষ্ট্রজীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি তা বিশ্বাস করে এবং যার চূড়ান্ত বিশ্বাস যে, ইসলাম নিজেই নিয়তির নিয়ামক এবং সে কোনো নিয়তির নির্দেশে চালিত হবে না। এই ধরনের মানুষ যেকোনো বিষয়কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে পারে না। আপনারা মনে করবেন না, আমি যে সমস্যার আভাস দিচ্ছি, তা নিছক কাল্পনিক ব্যাপার। এ হচ্ছে একটি অত্যন্ত জীবন্ত ও বাস্তব সমস্যা। জীবন ও আচরণ-পদ্ধতি হিসাবে ইসলামের কাঠামোর সাথেই যার সম্পর্ক রয়েছে। একমাত্র এরই সঠিক সমাধানের উপর নির্ভর করছে ভারতে সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক সত্তা হিসাবে আপনাদের ভবিষ্যৎ। আজকের দিনে ইসলামের সম্মুখে যে সংকট-পরিস্থিতি এসে হাজির হয়েছে, আমাদের ইতিহাসে এর চাইতে বৃহত্তর সংকট ইসলামের সম্মুখে আর কখনো আসেনি। একটি জাতির সম্মুখে তাদের সামাজিক কাঠামোর বুনিয়াদী নীতিসমূহ সংশোধন, পুনর্বিশ্লেষণ অথবা অগ্রাহ্য করার পথ উন্মুক্ত রয়েছে, কিন্তু কোনো নতুন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হবার আগে তারা কি করতে যাচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। যেভাবে আমি এই জরুরী সমস্যার আলোচনা করছি, তাতে কারো মনে করা উচিত হবে না যে, যাঁরা ভিন্ন ধারায় চিন্তা করেন, আমি তাঁদের সাথে কলহ করতে চাই। আপনারা একটি মুসলিম সমাবেশ এবং আমি মনে করি, আপনারা ইসলামের ভাবধারা ও আদর্শের প্রতি সত্যিকার আনুগত্য রক্ষা করতে উদ্বিগ্ন। সুতরাং আমার একমাত্র ইচ্ছা বর্তমান পরিস্থিতিতে যা আমি সত্য বলে সততার সাথে বিশ্বাস করি, তা-ই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা। কেবলমাত্র এই পন্থায়ই আমার নিজস্ব আলো দিয়ে আপনাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের পথে আলোক সঞ্চার করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে।

২। ভারতীয় জাতির ঐক্য

তা হলে আমাদের সমস্যা কি এবং তার তাৎপর্যই বা কি? ধর্ম কি একটি ঘরোয়া ব্যাপার মাত্র? আপনারা কি দেখতে চান যে, ইতিপূর্বে ইউরোপে খৃষ্টধর্ম যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, ইসলামী বিশ্বেও নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে ইসলাম সেই একই পরিণতি লাভ করুক? ধর্মীয় মনোভাব কোনো ভূমিকা পালন করবে না এমন ধরনের জাতীয় শাসনব্যবস্থা চালু করার জন্য ইসলামের শাসনব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে দিয়ে নৈতিক আদর্শ হিসাবে ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখা কি সম্ভব? ভারতে যেখানে মুসলিম জনগণ সংখ্যালঘু হয়ে আসছে, সেখানে এ প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম যে একটি ঘরোয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এ মতবাদ কোনো ইউরোপীয়দের মুখে বিস্ময়কর নয়। ইউরোপ একটি যৌক্তিক চিন্তাধারার পথ ধরে এই মতবাদের দিকে ধাবিত হয়। সন্যাসবাদী ধারা হিসাবে খৃষ্টধর্ম বস্তুজগতকে অস্বীকার করে এবং আত্মিক জগতের দিকে তার পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যার ফলশ্রুতিতে ইউরোপ এই মতবাদ অনুসরণ করে। রাসূল (সা) এর যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা কুর'আন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তার প্রকৃতি অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিছক জীবতাত্ত্বিক ঘটনা বলতে আমরা যা বুঝি, এ কেবল সেই ধরনের অভিজ্ঞতা নয়- যা অভিজ্ঞতালাভকারীর নিজের ভিতর ঘটে এবং সামাজিক, পারিপার্শ্বিকতার উপর যার কোনো প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য নয়। এ হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যা সামাজিক কাঠামোর জন্ম দেয়। এর অব্যবহিত পরিণাম হচ্ছে একটি বিশেষ রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থার বুনিয়াদ সৃষ্টি যার মধ্যে আইনগত ধারণাসমূহ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রয়েছে এবং এর উৎস কেবল ওহী বলেই তার সামাজিক গুরুত্বকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

সুতরাং ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ মৌলিক দিক থেকেই তার সৃষ্ট সামাজিক কাঠামোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটিকে অগ্রাহ্য করলে পরিণামে অপরটিকেও অগ্রাহ্য করতে হয়। সুতরাং জাতীয় ধারাসম্বলিত বিশেষ রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা (polity on national lines) গড়ে তুলতে গেলে যদি তার অর্থ হয় ইসলামী সংহতির নীতিকে বিপর্যস্ত করা, যেকোনো মুসলিম সে ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তাও করতে পারে না। এই সমস্যাই আজকের দিনের ভারতীয় মুসলিম জনগণের সামনে প্রত্যক্ষভাবে ধরা দিচ্ছে। রেনান বলেন: “Man is enslaved neither by his race, nor by his religion, nor by the course of rivers, nor by the direction of mountain ranges. A great aggregation of men, sane of mind and warm of heart, creates a moral consciousness which is called a nation.” - “ মানুষ তার বর্ণ, তার ধর্ম, নদীসমূহের স্রোত অথবা পর্বতমালার দিকনির্দেশনার দাস হয়ে থাকে না। এক বিরাট মানবসমষ্টি মানসিক স্থিরতা ও অন্তরের উষ্ণতা সহকারে যে নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে, তাঁরই নাম জাতি”। এমনভাবে সংগঠিত করা বেশ সম্ভব যদিও এর জন্য প্রায়গিক অর্থেই নতুন করে মানুষ বিনির্মাণের কঠিন এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া জড়িত এবং একইসাথে নতুন উন্মাদনার আঞ্জাম দেওয়া জরুরী। কবীরের শিক্ষা ও আকবরের ধর্মবিশ্বাস

দেশের জনগণের কল্পনা আকৃষ্ট করলে ভারতে এ সম্ভাবনা সত্যে পরিণত হত। অভিজ্ঞতায় অবশ্য দেখা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন জাত ও ধর্মীয় দলের মধ্যে তাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র সত্তাকে এক বৃহত্তর সামগ্র্যে বিলীন করে দেবার কোনো প্রবণতার আভাস পাওয়া যায় না। প্রত্যেক দল তার সমষ্টিগত অস্তিত্ব সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন। রেনানের ধারণা অনুযায়ী জাতির উপাদান সন্নিবেশ করার মতো নৈতিক চেতনা গড়ে তোলার জন্য যে মূল্য দেবার প্রয়োজন, ভারতের জাতিসমূহ সে মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়।

সুতরাং এক ভারতীয় জাতির ঐক্য খুঁজতে হবে বহুকে অস্বীকার করার ভিতরে নয়, বরং বহুর পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতার ভিতরে। সত্যিকার রাজনীতিজ্ঞান সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না, তা যতোই পীড়াদায়ক হোক। যেরূপ পরিস্থিতির অস্তিত্ব নেই, তার অস্তিত্ব কল্পনা করাই একমাত্র বাস্তবিক পন্থা নয়, বরং একমাত্র পন্থা হচ্ছে সত্যকে স্বীকার করা এবং তাকে আমাদের পক্ষে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা। এদিক দিয়ে ভারতীয় ঐক্য আবিষ্কার করার উপরই প্রকৃতপক্ষে ভারতের ও এশিয়ার ভাগ্য নির্ভর করে। ভারতই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম এশিয়া। তার অধিবাসীদের অংশ বিশেষের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য রয়েছে এশিয়ার পূর্ব অঞ্চলের জাতিসমূহের সাথে এবং অপর অংশের সাদৃশ্য রয়েছে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার জাতিসমূহের সাথে। ভারতে যদি কোনো কার্যকরী সহযোগিতার নীতি খুঁজে বের করা যায়, তাহলে তা এই প্রাচীন দেশে শান্তি ও পারস্পরিক সদিচ্ছা আনবে - যে দেশ তার অধিবাসীদের সহজাত অক্ষমতার কারণের চাইতেও বেশী করে তার ঐতিহাসিক অবস্থানের কারণে এত দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করছে। এবং এক সময়ে এটি সম্পূর্ণ এশিয়ার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করবে।

এটা অবশ্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, এমনি একটা অভ্যন্তরীণ ঐক্যের নীতি খুঁজে বের করার জন্য আমাদের অতদিনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কেন সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো? সম্ভবতঃ, আমরা পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি এবং ভিতরে ভিতরে পরস্পরের উপর আধিপত্য বিস্তার করার লক্ষ্য পোষণ করি। অবস্থা বিশেষে আমরা যেসব একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছি, পারস্পরিক সহযোগিতার উচ্চতর স্বার্থের খাতিরেও আমরা সম্ভবতঃ তা ত্যাগ করতে পারছি না এবং আমরা আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতাকে গোপন করছি জাতীয়তাবাদের আবরণে। বাইরে আমরা মহান দেশাত্মবোধের প্রেরণা যোগাই, কিন্তু ভিতরের দিকে আমরা জাত বা গোত্র বিশেষের মতোই সংকীর্ণমনা। সম্ভবতঃ আমরা স্বীকার করতে চাই না যে, প্রত্যেক দলেরই তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী অবাধ আত্মবিকাশের অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমাদের ব্যর্থতার কারণে যা-ই হোক, আমি এখনো আশান্বিত। ঘটনাপ্রবাহ কোনো বিশেষ ধরনের অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে বলে মনে হয়। মুসলিম মন সম্পর্কে আমি যতোটা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি, তাতে আমার একথা ঘোষণা করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, ভারতীয় মুসলিম তার নিজস্ব ভারতীয় আবাসভূমিতে নিজস্ব তমদ্দুন ও ঐতিহ্যের ধারা অনুযায়ী পূর্ণ ও অবাধ আত্মবিকাশের অধিকারী, স্থায়ী সাম্প্রদায়িক মীমাংসার বুনিয়াদ হিসাবে এই সত্য স্বীকৃতি হলে সে ভারতের আযাদীর জন্য তার সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকবে।

প্রত্যেক গোষ্ঠী তার নিজস্ব ধারায় স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের অধিকার রাখে, এই নীতি কোনো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। যে সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের প্রতি খারাপ মনোভাব পোষণ করে সে নীচ ও ঘৃণার্হ। অপর সম্প্রদায়সমূহের রীতিনীতি, কানুন, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের প্রতি আমি উচ্চতম শ্রদ্ধা পোষণ করি। এমন কি, কুর'আন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী প্রয়োজন হলে তাদের উপাসনাগারসমূহ সংরক্ষণ করাও আমার কর্তব্য। তথাপি যে সাম্প্রদায়িক দল আমার জীবন ও আচরণের উৎস এবং যার ধর্ম, যার সাহিত্য, যার চিন্তাধারা, যার তমদ্দুন আমায় বাস্তবে রূপায়ন করেছে এবং আমার চেতনায় যার সম্পূর্ণ অতীত এক জীবন্ত কার্যকরী উপাদান হিসাবে পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে, সেই বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলটিকে আমি ভালোবাসি। এমন কি, নেহরু রিপোর্টের প্রণেতাগণও সাম্প্রদায়িকতার এই উচ্চতর বৈশিষ্ট্যের মূল্য স্বীকার করেন। সিন্ধুর পৃথকীকরণের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা বলেন: "To say from the larger viewpoint of nationalism that no communal provinces should be created, is, in a way, equivalent to saying from the still wider international viewpoint that there should be no separate nations. Both these statements have a measure of truth in them. But the staunchest internationalist recognizes that without the fullest national autonomy it is extraordinarily difficult to create the international State. So also without the fullest cultural autonomy - and communalism in its better aspect is culture - it will be difficult to create a harmonious nation." - " কোনো সাম্প্রদায়িক প্রদেশ সৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ কথা বলতে যাওয়া আরো ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এইরূপ বলারই সমার্থক যে, কোনো স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়। এই উভয় উক্তির মধ্যেই কতকটা সত্য নিহিত রয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক নিষ্ঠাবান আন্তর্জাতিকতাবাদীও স্বীকার করেন যে, পূর্ণতম জাতীয় স্বাধিকার ব্যতীত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা অত্যধিক দুরূহ। তেমনি পূর্ণতম সাংস্কৃতিক স্বাধিকার ব্যতীত এক ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলাও হবে কঠিন, কেননা সাম্প্রদায়িকতার অধিকতর ভাল দিকই হচ্ছে সংস্কৃতি।"

৩। ভারতের মধ্যে মুসলিম ভারত

সুতরাং ভারতের মতো দেশে এক ঐক্যবদ্ধ সামগ্র্য গঠনের জন্য উচ্চতর বৈশিষ্ট্য-সহকারে সাম্প্রদায়িকতা অপরিহার্য। ভারতীয় সমাজের ইউনিটসমূহ ইউরোপীয় দেশসমূহের মতো আঞ্চলিক নয়। ভারত বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী বিভিন্ন মানব-সমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত এক মহাদেশ। তাদের আচরণ এক সাধারণ বর্ণ-চেতনা (race consciousness) দ্বারা মোটেই নির্ধারিত নয়। এমনকি, হিন্দুরাই এক সমজাতীয় গোষ্ঠী গড়ে তোলেনি। সাম্প্রদায়িক দলসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার না করে ভারতে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের নীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে না। সুতরাং ভারতের ভিতরে এক মুসলিম ভারত গড়ে তোলার জন্য উত্থাপিত মুসলিম দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। আমার মতে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনের (All Parties Muslim Conference) গৃহীত প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে এক ঐক্যবদ্ধ সামগ্র গঠনেরই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তা তার অন্তর্গত বিভিন্ন সমগ্র দল নিজ নিজ সত্তাকে বাধাগ্রস্ত করার পরিবর্তে বরং তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত করার পরিপূর্ণ সুযোগ তাদেরকে দেবে। এই সভা উক্ত প্রস্তাবে বিধৃত মুসলিম দাবীসমূহ জোরের সাথে সমর্থন করবেন, সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

ব্যক্তিগতভাবে আমি উক্ত প্রস্তাবে বিধৃত দাবীসমূহের চাইতেও কিছুতা বেশী অগ্রসর হতে চাই। আমি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে একটি একীভূত রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে অথবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে স্বায়ত্তশাসন, এক ঐক্যবদ্ধ উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রগঠন, আমার কাছে মুসলমানদের, অন্ততঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের চূড়ান্ত ঠিকানা বলে মনে হয়। প্রস্তাবটি নেহরু কমিটির সামনে পেশ করা হয়েছিলো। এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে তা হবে পরিচালনার অনুপযোগী একটি রাষ্ট্র এই যুক্তিতে তারা প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেছিলেন। আয়তনের দিক বিবেচনা করলে এ কথা সত্য; জনসংখ্যর দিক দিয়ে এই প্রস্তাবে পরিকল্পিত রাষ্ট্র বর্তমানের কোনো কোনো ভারতীয় প্রদেশ অপেক্ষাও ছোট হবে। আম্বালা বিভাগ ও সম্ভবতঃ অমুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ কতিপয় জেলার বহির্ভূক্তি তাকে পরিধির দিক দিয়ে আরো অল্প পরিসর ও অধিকতর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ করবে, এবং তার ফলে এই নবগঠিত রাষ্ট্র তার এলাকার মধ্যে অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে কার্যকরীভাবে সংরক্ষণের অধিকতর সামর্থ্য লাভ করবে। এই ধারণায় হিন্দু বা বৃটিশ জনগণের কোনরূপ আতঙ্কের কারণ নেই। ভারত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দেশ। এ দেশে সাংস্কৃতিক শক্তি হিসাবে ইসলামের জীবন সব চাইতে বেশী করে নির্ভর করে তাকে এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের কেন্দ্রীভূতকরণের উপর। ভারতীয় মুসলিমদের সর্বাধিক অংশের এই কেন্দ্রীভূতকরণে ভারতের ও এশিয়ার সমস্যার সমাধান হবে। বৃটিশ সরকারের অসংগত আচরণ সত্ত্বেও যাদের সামরিক ও পুলিশ বিভাগের চাকুরী দ্বারা এ দেশে বৃটিশ শাসন চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। এ কেন্দ্রীভূতকরণের ফলে তাদের দায়িত্ববোধ তীব্রতর হবে এবং তাদের দেশাত্ববোধের মনোভাব প্রবলতর হবে।

এমনি করে ভারতীয় রাষ্ট্রের ভিতরে পূর্ণ আত্মবিকাশের সুবিধা লাভ করলে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক বলে প্রমাণিত হবে, সে হামলা আদর্শিক হোক অথবা বেয়নেটেরই হোক। শতকরা ৫৬ ভাগ মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে পাঞ্জাব ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শতকরা ৫৪ ভাগ লোক সরবরাহ করে থাকে এবং নেপালের স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে নিযুক্ত ১৯ হাজার গুর্খাকে বাদ দিলে পাঞ্জাবী সৈন্যদের সংখ্যা দাঁড়ায় সমগ্র ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শতকরা ৬২ ভাগ। এই শতকরা হারের মধ্যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান থেকে সংগৃহীত প্রায় ছয় হাজার সশস্ত্র সৈন্যকে ধরা হয়নি। বৈদেশিক হামলা থেকে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিমদের সম্ভাবনার হিসাব এ থেকে আপনারা সহজেই করে নিতে পারেন। রাইট অনারেবল মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মনে করেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য মুসলিমদের এই দাবীর পশ্চাতে রয়েছে ‘ জরুরী অবস্থায় ভারত সরকারের উপর চাপ দেবার উপায় অর্জনের জন্য’ তাদের ইচ্ছা। আমি তাঁকে স্পষ্টভাবে বলতে পারি, তিনি যে ধরনের উদ্দেশ্য আমাদের প্রতি আরোপ করেন, মুসলিম দাবী তা থেকে উদ্ভূত নয়; এর মূলে রয়েছে অবাধ আত্মবিকাশের অকৃত্তিম আকাঙ্ক্ষা, যা সমগ্র ভারতের উপর স্থায়ী সাম্প্রদায়িক আধিপত্য লাভের উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী হিন্দু রাজনীতিকদের পরিকল্পিত ইউনিটারী ধরনের শাসনব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব।

হিন্দুদের এরূপ কোনো ভয়ের কারণ নেই যে, স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টির অর্থ হবে এইরূপ রাষ্ট্রে এক ধরনের ধর্মীয় শাসন প্রবর্তন। ইসলামের ক্ষেত্রে এই ধর্ম শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা আমি এর আগেই আপনাদেরকে বলেছি। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোনো যাজকতন্ত্র নয়। এ হচ্ছে রুশোর এ ধরনের চিন্তা করার বহুপূর্বে চুক্তিবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে পরিকল্পিত এক রাষ্ট্র এবং তা এমন এক নৈতিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, যাতে মানুষকে বিশ্বের কোনো বিশেষ অংশের দ্বারা পরিচিত ভূমিকেন্দ্রিক প্রাণী (Earth-rooted creature) হিসাবে ধরা হয় না, বরং তাদেরকে ধরা হয় সামাজিক সংগঠনের (Social Mechanism) নীতি অনুয়ায়ী আত্মিক সত্তা হিসাবে এবং সে সংগঠনের জীবন্ত অংশ হিসাবে তার অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত রয়েছে। কিছুকাল আগে ‘ টাইমস অফ ইন্ডিয়া’ ভারতীয় ব্যাংকিং ইনকুয়ারী কমিটি সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে যা বলেছিলেন, তা থেকে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিচার করা যেতে পারে। পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছিলো: “In ancient India,

the State framed laws regulating the rates of interest, but in Muslim times, although Islam clearly forbids the realization of interest on money loaned, Indian Muslim States imposed no restriction on such rates." - " প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র সুদের হার নিয়ন্ত্রিত করে আইন প্রণয়ন করতো, কিন্তু ইসলামে ঋণ হিসাবে নিয়োজিত অর্থের সুদগ্রহণ সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হলেও ভারতীয় মুসলিম রাজ্যসমূহ এইরূপ হারের উপর কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে নি।" সুতরাং আমি ভারতের ও ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থেই একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানাচ্ছি। ভারতের পক্ষে এর ফলে সম্ভব হবে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ভারসাম্য বিধান করে নিরাপত্তা ও শান্তি কায়েম করা। আর ইসলাম এতে আরব সাম্রাজ্যবাদের ছাপ থেকে মুক্তি লাভের এবং তার কানুন, তার শিক্ষা ও তার সংস্কৃতিকে সুসংহত করে তার নিজস্ব বুনিয়াদী ভাবধারা ও আধুনিক কালের ভাবধারার সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিধানের সুযোগ পাবে।

৪। ফেডারেল রাষ্ট্র

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, ভারতে আবহাওয়া, জাতি, ভাষা, ধর্মমত ও সামাজিক পদ্ধতির অসংখ্যবিদ বৈচিত্র্য বিবেচনায় ভাষা, জাতি, ইতিহাস, ধর্মের ঐক্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সাদৃশ্যের বুনিয়াদে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসমূহ গড়ে তোলাই হচ্ছে ভারতে একটি স্থায়ী সাংবিধানিক কাঠামো কায়েম করবার একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা। সাইমন রিপোর্ট অনুযায়ী ফেডারেশনের ধারণায় জনপরিষদ হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ তুলে দিয়ে তাঁকে ফেডারেল রাষ্ট্রসমূহের এক প্রতিনিধি পরিষদে পরিণত করার দাবি রাখে। আমি যা বলেছি, সেই অনুযায়ী এতে অঞ্চল পুনর্বিভাগেরও প্রয়োজন হবে। রিপোর্টে উভয়বিধ সুপারিশ রয়েছে। এই ব্যাপার সম্পর্কে রিপোর্টে প্রকাশিত মনোভাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং প্রস্তাব করি যে, সাইমন রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী অঞ্চল পুনর্বিভাগের ক্ষেত্রে দুটি শর্ত অবশ্য পূরণ করতে হবে। নতুন সংবিধান প্রবর্তনের আগেই অবশ্য এ কাজটি সম্পাদন করতে হবে এবং তা এমনভাবে পরিকল্পিত হবে, যাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান চূড়ান্তভাবে করা যেতে পারে। সঠিক পুনর্বিভাগের ফলে ভারতের সাংবিধানিক বিতর্কের ক্ষেত্র থেকে যুক্ত ও পৃথক নির্বাচনের প্রশ্ন স্বতঃই বিলুপ্ত হবে। বিদ্যমান প্রাদেশিক কাঠামোই এই বিতর্কের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

হিন্দু জাতি মনে করে যে, পৃথক নির্বাচন জাতীয়তাবাদের ভাবধারার পরিপন্থী, কারণ 'জাতি' বলতে সে বোঝে এক ধরনের সার্বজনীন সংযোগ, যাতে কোনো সাম্প্রদায়িক সত্তা (communal entity) তার স্বাতন্ত্র্য (private individuality) বজায় রাখতে পারবে না। এরূপ পরিস্থিতির অস্তিত্ব অবশ্য নেই। তার অস্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়ও নয়। ভারত হচ্ছে জাতি ও ধর্মের বহুবিধ বৈচিত্র্যের দেশ। এর সাথে মুসলিমদের, বিশেষ করে পাঞ্জাবের মুসলিমদের সাধারণ অর্থনৈতিক দুর্দশা, তাদের সীমাহীন ঋণ এবং বর্তমানে গঠিত কয়েকটি প্রদেশে তাদের অপর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা মিলিয়ে বিবেচনা করুন, তাহলেই আমাদের পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বজায় রাখার জন্য উদ্বেগের তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। এরূপ একটি দেশে এবং এরূপ পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক নির্বাচন দ্বারা সর্বপ্রকার স্বার্থে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করা যায় না এবং তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে মুষ্টিমেয় লোকের শাসন (Oligarchy) কায়েম হতে বাধ্য। যদি এমনভাবে প্রদেশগুলোর সীমানা চিহ্নিত করা যায়, যাতে অপেক্ষাকৃত সমজাতীয় সম্প্রদায়সমূহের ভাষাগত, বর্ণগত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য কায়েম করা সম্ভব হবে, তাহলে নিছক আঞ্চলিক নির্বাচন পদ্ধতিতেও ভারতীয় মুসলিমদের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

৫। সাইমন রিপোর্টের আলোকে ফেডারেশন

কিন্তু কেন্দ্রীয় ফেডারেল রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ভারতীয় পণ্ডিতদের ও ইংল্যাণ্ডের পণ্ডিতদের প্রস্তাবিত সংবিধানে উদ্দেশ্যর সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে যেভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব রয়েছে, ভারতীয় পণ্ডিতরা তাতে নাড়াচারা দিতে চান না। তাঁদের আশা হচ্ছে, যে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে তাঁরা অব্যাহত রাখবেন, তার কাছে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে এবং সেখানে মনোনীত সদস্যের অস্তিত্ব না থেকে তাদেরই প্রতিনিধিত্ব আরো বলিষ্ঠ হবে। পক্ষান্তরে, ইংল্যাণ্ডের পণ্ডিতরা উপলব্ধি করে যে, দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথে আরো কিছুটা অগ্রসর হলে কেন্দ্রে গণতন্ত্র প্রবর্তন তাঁদের স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করবে এবং বর্তমানে তাঁরা যে ক্ষমতা ভোগ করছেন, তার সবটুকুই কেন্দ্রের হাতে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে; তাই তাঁরা গণতন্ত্রের প্রয়োগক্ষমতা কেন্দ্র থেকে প্রদেশসমূহের উপর ন্যস্ত করেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা ফেডারেশনের নীতি প্রবর্তন করছেন এবং বিশেষ বিশেষ প্রস্তাব পেশ করে তার যাত্রা সূচনা করেছেন; তথাপি মুসলিম ভারতের দৃষ্টিতে যেসব বিবেচনার বুনিয়াদে এই নীতির মান নির্ধারিত হচ্ছে, তা থেকে তাঁদের বিবেচনা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মুসলিম জনগণ ফেডারশনের দাবী করে, কারণ এটাই হচ্ছে ভারতের সর্বাধিক জটিল সমস্যার বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান। রয়াল কমিশনের সদস্যবৃন্দের ফেডারেশন সম্পর্কিত মনোভাব নীতির দিক দিয়ে সুষ্ঠু হলেও তাঁদের লক্ষ্য ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত রাজ্যসমূহের দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা বলে মনে হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা বৃটিশের পক্ষে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার হাত থেকে রেহাই পাবার পন্থা

উদ্ভাবনের বেশী এতে কিছুই করা হয়নি এবং এতে সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে পূর্ববৎ অমীমাংসিত রেখে তাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, প্রকৃত ফেডারেশনের কথা বলতে গেলে তাৎপর্যের দিক দিয়ে সাইমন রিপোর্টে প্রকৃতপক্ষে ফেডারেশনের নীতির বিপরীত ব্যবস্থা করা হয়েছে। নেহরু রিপোর্ট কেন্দ্রীয় পরিষদের হিন্দু সংখ্যাধিক্য উপলব্ধি করে এক ইউনিটারী ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন, কারণ এই ধরনের ব্যবস্থায় সারা ভারতে হিন্দু আধিপত্য কায়েম রাখা সম্ভব হবে; সাইমন রিপোর্টে কৃত্তিম ফেডারেশনের সুক্ষ্ণ আবরণের অন্তরালে বৃটিশ আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর আংশিক কারণ হচ্ছে বৃটিশ জাতি এতকাল ধরে যে ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে, সে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই অনিচ্ছুক এবং আংশিক কারণ হচ্ছে, ভারতে আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক সমঝোতা না হলে সে ক্ষমতা তাঁদের নিজের হাতে রাখার পক্ষে একটা টেকসই অজুহাত খাড়া করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে। স্বায়ত্তশাসিত ভারতে ইউনিটারী ধরনের সরকার প্রবর্তন আমার মতে সোজা কথায় অভাবনীয়। যাকে বলে ‘রেজিডুয়ারী ক্ষমতা’ (Residuary Power), তা সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যসমূহের উপর ন্যস্ত করতে হবে এবং ফেডারেল রাজ্যগুলোর প্রকাশ্য সম্মতিক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতাই কেবল কেন্দ্রীয় ফেডারেল রাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে। বৃটেন অথবা ভারত - যেখানেই জন্ম লাভ করুক, যে শাসনব্যবস্থায় সত্যিকারের ফেডারেশনের নীতি স্বীকৃত হবে না বা তাদেরকে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হবে তাতে মুসলিম জনগণকে সম্মতি দান করতে আমি কখনো উপদেশ দেব না।

৬। গোলটেবিল সম্মেলনে ফেডারেল প্রস্তাবের আলাপ

সম্ভবতঃ, বৃটিশ কর্তৃক এই পরিবর্তনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা আবিষ্কৃত হবার দীর্ঘকাল পূর্বেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামোয় পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিলো। সে কারণেই বরং খানিকটা বিলম্বে ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় রাজন্যবর্গের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ভারতীয় জনগণের, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের কাছে এ এক ধরনের বিস্ময়কর ব্যাপারে যে, ভারতীয় রাজন্যবর্গ গোলটেবিল বৈঠকে সর্বভারতীয় ফেডারেশনে যোগদানের পক্ষে নাটকীয়ভাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন এবং তার ফল এই যে যে-সকল হিন্দু প্রতিনিধিরা ইউনিটারী ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষ সমর্থনে কোনোরূপ আপোষ করতে রাজি ছিলেন না, তাঁরাও ফেডারেল পরিকল্পনার প্রস্তাবে নির্বিকার সম্মতি দিয়েছেন। এমনকি, যে মিঃ শাস্ত্রী মাত্র কয়েকদিন আগে ভারতের জন্য একটি ফেডারেল পরিকল্পনার সুপারিশ করায় স্যার জনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, তিনিও আকস্মিকভাবে তাঁর মত পরিবর্তন করে ফেলেন এবং বৈঠকের সাধারণ অধিবেশনে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘোষণা করে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে তার উপসংহার বক্তৃতায় একটা অত্যধিক চমকপ্রদ মন্তব্য করবার সুযোগ দিলেন। যে বৃটিশরা সম্মেলনে ভারতীয় রাজন্যবর্গের অংশগ্রহণ কামনা করেছলিন এবং যে হিন্দুরা অকুন্ঠচিত্তে সর্বভারতীয় ফেডারশনের বিবর্তন মেনে নিয়েছেন, তাদের উভয়ের কাছে এসব ব্যাপারের একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, যে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে মাত্র কয়েকজন মুসলিম, ফেডারেশন পরিকল্পনায় তাঁদের অংশ গ্রহণের ফলে দু’টো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। একদিকে ভারতে ব্রিটিশদের কর্তৃত্ব যেমনি আছে তেমনি টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে, অপরদিকে এতে সর্বভারতীয় ফেডারেল এসেম্বলীতে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ হবে।

আমার মনে হয়, রাজন্যবর্গের মধ্যস্থতায় বৃটিশ রাজনীতিকরা চাতুর্যের সাথে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম মতানৈক্যের সুবিধা গ্রহণ করছেন এবং রাজন্যবর্গও দেখতে পাচ্ছেন যে, এই পরিকল্পনায় তাঁদের স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসন কায়েম রাখা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। মুসলিম জনগণ যদি এই ধরনের পরিকল্পনায় নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করে, তাঁর ফলে সোজাসুজি ভারতে রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে তাঁদের সমাপ্তি ত্বরান্বিত হবে। এইভাবে সৃষ্ট ভারতীয় ফেডারশনের নীতি কেন্দ্রীয় ফেডারেল এসেম্বলীতে বৃহত্তম দল হিসাবে হিন্দু রাজন্যবর্গ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে।

If, therefore, the British Indian provinces are not transformed into really autonomous States, the Princes' participation in a scheme of Indian federation will be interpreted only as a dexterous move on the part of British politicians to satisfy, without parting with any real power, all parties concerned - Muslims with the word federation; Hindus with a majority in the Centre; the British Imperialists - with the substance of real power.

সাম্রাজ্যের স্বার্থের ক্ষেত্রে তাঁরা সবসময়েই ব্রিটিশ রাজকে সমর্থন করবেন এবং দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় তাঁরা হিন্দু প্রাধান্য বজায় রাখার ও তাঁকে বলিষ্ঠ করায় সাহায্য করবেন। অন্য কথায়, এই পরিকল্পনার লক্ষ্য মনে হচ্ছে হিন্দু ভারত ও বৃটিশ

সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা - তোমরা আমায় ভারতের চিরস্থায়ীভাবে কায়েম করে রাখ, আর তাঁর প্রতিদানে আমি তোমাদেরকে অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়কে স্থায়ী দাসত্বে আবদ্ধ করে রাখার জন্য হিন্দু একনায়কত্বের (Hindu Oligarchy) অধিকার দান করছি। সুতরাং যদি ভারতীয় প্রদেশসমূহকে সত্যিকার স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য রূপান্তরিত করা না হয়, তা হলে ভারতীয় ফেডারেশন পরিকল্পনায় রাজন্যবর্গের অংশগ্রহণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেবলমাত্র এই কথাই বলতে হবে যে, এটা হচ্ছে ক্ষমতা হস্তচ্যুত না করে সংশ্লিষ্ট সকল দলকে খুশী করার জন্য বৃটিশ রাজনীতিকদের সুচতুর পরিকল্পনা। তাঁরা চান মুসলিম জনগণকে ফেডারেশন শব্দটি দিয়ে খুশী করতে, হিন্দুদেরকে কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরকে সত্যিকার ক্ষমতার সারবস্তু দিয়ে খুশী করতে।

ভারতে হিন্দু রাজ্যের সংখ্যা মুসলিম রাজ্যের সংখ্যা থেকে বহুগুণে অধিক; এবং দেখার ব্যাপারে হচ্ছে, বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্য থেকে গৃহীত প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে গঠিত আইনসভায় কি করে কেন্দ্রীয় ফেডারেল এসেম্বলীতে মুসলমানদের শতকরা ৩৩ ভাগ আসন লাভের দাবী মিটানো হবে। আমি আশা করি, গোলটেবিল বৈঠকে আলোচিত ফেডারেল পরিকল্পনার তাৎপর্য সম্পর্কে মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ পূর্ণরূপে অবহিত রয়েছেন। প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় ফেডারেশনে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন এখনো আলোচনা করা হয়নি। রয়টার্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বলা হয়েছে: “The interim report contemplates two chambers in the Federal Legislature, each containing representatives both of British India and States, the proportion of which will be a matter of subsequent consideration under the heads which have not yet been referred to the Sub-Committee.” - “ অন্তর্বর্তী রিপোর্টে ফেডারেল আইনুসভায় দু' টি পরিষদের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং তাঁর প্রত্যেকটিতে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্বের অনুপাত বিভিন্ন দফায় পরবর্তী বিবেচনার বিষয় হবে এবং সে দফাগুলি এখনো সাব-কমিটির হাতে ন্যস্ত করা হয়নি।” আমার মতে সংখ্যানুপাতের প্রশ্ন হচ্ছে সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং তা পরিষদের কাঠামো সংক্রান্ত মূল প্রশ্নের সাথে একই সময়ে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

আমি মনে করি, কেবলমাত্র বৃটিশ ভারতীয় ফেডারেশন থেকে শুরু করাই হতো সর্বোত্তম পন্থা। যে ফেডারেল পরিকল্পনা গণতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের অসাধু সংযোগে জন্ম লাভ করেছে, তা বৃটিশ ভারতকে ইউনিটারী কেন্দ্রীয় সরকারের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এই ধরনের ইউনিটারী শাসন পদ্ধতি বৃটিশ জাতি, বৃটিশ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ও ভারতীর দেশীয় রাজন্যবর্গের সর্বাধিক কল্যাণের বাহক হতে পারে; কিন্তু জনগণের জন্য এগারোটি ভারতীয় প্রদেশের পাঁচটিতে পূর্ণ রেসিডুয়ারী ক্ষমতাসহ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার এবং ফেডারেল এসেম্বলীর মোট সদস্যসংখ্যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত না হলে এতে তাঁদের কোনো কল্যাণই আসতে পার না। বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহের সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের কথা বলতে গেলে ভূপালের মহামান্য নওবাব, স্যার আকবর হায়দরী ও মিঃ জিন্নার মর্যাদা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য ভারতীয় ফেডারেশনে রাজন্যবর্গের অংশগ্রহণের দিক বিবেচনা করে বৃটিশ ভারতীয় পরিষদে আমাদের প্রতিনিধিত্বের দাবীকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে। এ প্রশ্নটি ভারতীয় এসেম্বলীতে মুসলিমদের অংশের প্রশ্নই নয়, বরং এ সর্বভারতীয় ফেডারেল এসেম্বলীতে বৃটিশ ভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিত্বের সাথে জড়িত। এখন আমাদের শতকরা ৩৩ ভাগ প্রতিনিধিত্ব দাবীকে ফেডারেশনে অংশগ্রহণকারী মুসলিম রাজ্যগুলোর অংশ বাদ দিয়ে সর্বভারতীয় ফেডারেল এসেম্বলীতে অনুরূপ হার প্রতিনিধিত্বের দাবী বলে ধরে নিতে হবে।

৭। প্রতিরক্ষা সমস্যা

ভারতে ফেডারেল শাসন পদ্ধতির সাফল্যজনকভাবে কার্যকরী করার পথে অপর যে জটিল সমস্যা রয়েছে, তা হচ্ছে ভারতের প্রতিরক্ষা সমস্যা। রয়াল কমিশনের সদস্যবর্গ এই সমস্যা সম্পর্কে তাদের আলোচনায় সামরিক বাহিনীকে ব্রিটিশ রাজের পরিচালনায় রাখার পক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্য ভারতের সর্বপ্রকার দুর্বলতা তুলে ধরেছেন। কমিশন সদস্যগণ বলেন: "India and Britain are so related that India's defence cannot, now or in any future which is within sight, be regarded as a matter of purely Indian concern. The control and direction of such an army must rest in the hands of agents of Imperial Government." - ভারত ও বৃটেন এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, ভারত রক্ষার ব্যাপার বর্তমানে অথবা কোনো নিকট ভবিষ্যতে নিছক ভারতীয় দায়িত্ব বলে গণ্য হতে পারে না। এইরূপ সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশদানের দায়িত্ব ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধিদের হাতে থাকতেই হবে।” এখন এর পরবর্তী অপরিহার্য সিদ্ধান্ত কি এই যে, বৃটিশ কর্মচারী ও বৃটিশ সৈন্যদের সাহায্য ব্যতীত দেশরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অধিকার অর্জনের পথ বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকবে? বর্তমান পরিস্থিতি যা তাতে সাংবিধানিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নেহরু রিপোর্টে প্রকাশিত মনোভাব বজায় থাকলে ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্টের ঘোষণায় বিধৃত চূড়ান্ত লক্ষ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের বিবর্তনের সকল আশা অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যর্থ হবার মত বিপদজনক সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কোনোরূপ সম্ভাব্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর পরিচালনা ভার একটি নির্বাচিত ভারতীয় আইনসভার

কর্তৃত্বাধীনে ছেড়ে দিতে হবে। তাঁদের যুক্তিকে আরো বলিষ্ঠ করে তোলার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপক পার্থক্যযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহের অস্তিত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সমস্যাটিকে সমাধানের অতীত বলে প্রতীয়মান করবার চেষ্টা করে মন্তব্য করেছেন: "the obvious fact that India is not, in the ordinary and natural sense, a single nation is nowhere made more plain than in considering the difference between the martial races of India and the rest." – " সাধারণ ও প্রাকৃতিকভাবেই ভারত যে এক অখন্ড জাতি নয়, তা ভারতের সামরিক গোত্রসমূহের ও অবশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনার ক্ষেত্রে যেমন সুস্পষ্ট এবং সহজভাবে প্রমাণিত হয়েছে তেমন আর কোথাও হয়নি।" প্রশ্নটির এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে এই কথা প্রমাণ করে দেখাবার জন্য, বৃটিশ জাতি ভারতকে কেবল বৈদেশিক আক্রমণের বিপদ থেকেই নিরাপদ রাখছে না, বরং তারাই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ব্যাপারেও ' নিরপেক্ষ অভিভাবক' ।

অবশ্য ফেডারেশন বলতে আমি যা বুঝি, তাতে ফেডারেল শাসনাধীন ভারতে সমস্যার একটি মাত্র দিক থাকবে; তা হচ্ছে বাইরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাদেশিক সামরিক বাহিনী ছাড়াও ভারতীয় ফেডারেল কংগ্রেস উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি বলিষ্ঠ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী গঠন করতে পারেন। সকল প্রদেশ থেকে সংগৃহীত সৈন্যদের কতকগুলো ইউনিট নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করা যেতে পারে এবং সকল সম্প্রদায় থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ সামরিক লোকদেরকে অফিসার পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। আমি জানি, ভারতে যোগ্যতাসম্পন্ন সামরিক অফিসারের অভাব রয়েছে এবং রয়াল কমিশনের সদস্যবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাপনার পক্ষে যুক্তি খাড়া করবার জন্য এই সত্যেরই সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এই বিষয় সম্পর্কে আমি রিপোর্ট থেকে আর একটি অংশ উদ্ধৃত না করে পারছি না। আমার মনে হয়, এই উদ্ধৃতিটি কমিশন সদস্যদের যুক্তির বিরুদ্ধে সর্বোত্তম যুক্তি হিসাবে পেশ করা যেতে পারে। রিপোর্ট বলা হয়েছে: "At the present moment, no Indian holding the King's Commission is of higher army rank than a captain. There are, we believe, 39 captains of whom 25 are in ordinary regimental employ. Some of them are of an age which would prevent their attaining much higher rank, even if they passed the necessary examination before retirement. Most of these have not been through Sandhurst, but got their Commissions during the Great War." – " বর্তমান মুহূর্তে ক্যাপ্টেন অপেক্ষা উচ্চ পদে রাজকীয় কমিশন প্রাপ্ত ভারতীয় সামরিক অফিসার নেই। আমাদের বিশ্বাস, মোট ৩৯ জন ক্যাপ্টেন রয়েছে এবং তাঁর মধ্যে ২৫ জন সাধারণ রেজিমেন্টের চাকুরীতে নিযুক্ত রয়েছে, তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছে, যাদের বয়স তাঁদের অধিকতর উচ্চপদ লাভের অন্তরায় হবে, যদিও তাঁরা অবসর গ্রহণের আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। এদের অধিকাংশই স্যান্ডহার্স্টের শিক্ষা লাভ করেনি, কিন্তু তাঁরা কমিশন পেয়েছিলো গত মহাযুদ্ধের আমলে।" এখন এই রূপান্তর সাধনের ইচ্ছা যতোই অকৃত্রিম হোক এবং তাঁর প্রচেষ্টা যতোই ঐকান্তিক হোক, স্কীন কমিটি (চেয়ারম্যান ও সামরিক সেক্রেটারী ব্যতীত যার সদসবৃন্দের সকলেই ভারতীয়) নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে কতকগুলি অপরিহার্য শর্ত বিশেষ জোরের সাথে আরোপ করেছেন: "Progress...must be contingent upon success being secured at each stage and upon military efficiency being maintained, though it must in any case render such development measured and slow. A higher command cannot be evolved at short notice out of existing cadres of Indian officers, all of junior rank and limited experience. Not until the slender trickle of suitable Indian recruits for the officer class – and we earnestly desire an increase in their numbers – flows in much greater volume, not until sufficient Indians have attained the experience and training requisite to provide all the officers for, at any rate, some Indian regiments, not until such units have stood the only test which can possibly determine their efficiency, and not until Indian officers have qualified by a successful army career for the high command, will it be possible to develop the policy of Indianisation to a point which will bring a completely Indianised army within sight. Even then years must elapse before the process could be completed." – ' অগ্রগতি অবশ্যই নির্ভর করে প্রত্যেক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন ও সামরিক যোগ্যতা বজায় রাখার উপর, যদিও যে কোনো ক্ষেত্রে অনুরূপ উন্নয়ন বিধান ধীর ও মন্থরগতি হতে বাধ্য। বর্তমানে যেসব ভারতীয় অফিসার রয়েছে, তাঁদের সকলেই জুনিয়র পদে নিযুক্ত ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং তাদেরকে স্বল্পকালের নোটিশে উচ্চতর কমান্ডে উন্নীত করা যেতে পারে না। অফিসার পদের জন্য যে স্বল্পসংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় এগিয়ে আসছে – এবং আমরা ঐকান্তিকভাবে তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি কামনা করি; যতদিন না তাঁরা আরো অধিক সংখ্যায় এগিয়ে আসে, যতদিন না যে কোনো উপায়ে কতিপয় ভারতীয় রেজিমেন্টের সকল অফিসার পদ পূরণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ভারতীয় প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগ্রহণ করে, যতদিন না এই ধরনের ইউনিটসমূহ তাঁদের যোগ্যতা নির্ধারনের জন্য সম্ভাব্য একমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং যতদিন না ভারতীয় অফিসারগণ সাফল্যপূর্ণ সামরিক জীবন দ্বারা উর্ধ্বতন কমান্ডের যোগ্যতা অর্জন করে, ততদিন পর্যন্ত কি ভারতীয়করণ নীতির বিবর্তন এমনভাবে সম্ভব হবে, যার ফলে সামরিক বাহিনীর পূর্ণ ভারতীয়করণ সম্ভব হবে? এমন কি তখনো এ বিবর্তনের

ধারা পূর্ণ করে আনতে বহু বছর পার হয়ে যাবে।”

আমি এখন প্রশ্ন করতে চাই: বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? এর কারণ কি আমাদের এই যোদ্ধা জাতিসমূহের কোনো সহজাত অযোগ্যতা, না সামরিক শিক্ষাধারার মন্থরগতি? আমাদের যোদ্ধা জাতিসমূহের সামরিক যোগ্যতা অনস্বীকার্য। সামরিক শিক্ষার ধারা মানবীয় শিক্ষার অন্যবিধ ধারাসমূহের তুলনায় ধীরুগতিতে হতে পারে। এ ব্যাপারে বিচার করার মতো সামরিক বিশেষজ্ঞ আমি নই। কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি অনুভব করি যে, উল্লিখিত যুক্তি দ্বারা এই শিক্ষাধারাকে অন্তহীন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে ভারতের স্থায়ী দাসত্ব এবং এতে নেহরু রিপোর্টে পরিকল্পিত সীমারক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব একটি প্রতিরক্ষা কমিটির হাতে ন্যস্ত করার প্রয়োজন আরো বেশী করে দেখা দিয়েছে। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এই কমিটির সদস্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

পুনরায় এ ব্যাপারটিও তাৎপর্যপূর্ণ যে, সাইমন রিপোর্ট ভারতের স্থলসীমান্তের প্রশ্নের উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু নৌবাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা কেবল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন মাত্র। ভারত নিঃসন্দেহে তার স্থলসীমান্ত থেকেই আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়েছে; কিন্তু এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট যে, তাঁর অরক্ষিত সমুদ্রোপকূলের সুযোগ নিয়েই বর্তমান প্রভুরা তাঁর উপর দখল নিয়েছে। এখনকার দিনে স্বায়ত্তশাসিত আযাদ ভারত তাঁর স্থলসীমান্ত অপেক্ষা অধিকতর যত্নসহকারে সমুদ্রোপকূল রক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ফেডারেল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম ফেডারেল রাজ্যসমূহ ভারতের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার জন্য স্বেচ্ছায় নিরপেক্ষ ভারতীয় সামরিক ও নৌবাহিনী গঠনে সম্মত হবে, সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। মোগল শাসন আমলে এই ধরণের নিরপেক্ষ সামরিক বাহিনী বাস্তবে রূপলাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে আকবরের আমলে মোটের উপর হিন্দু সেনাপতিদের পরিচালনাধীন বাহিনী দ্বারাই ভারতীয় সীমান্ত রক্ষিত হত। আমি নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করি যে, ফেডারেল শাসনাধীন ভারতের বুনিয়াদে একটি নিরপেক্ষ সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা মুসলিম জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধের অনুভূতি তীব্রতর করবে এবং কোনোরূপ আগ্রাসনের সময়ে ভারতীয় মুসলিমরা সীমান্তের বাইরের মুসলিমদের সাথে যুক্ত হবে বলে যে সন্দেহ পোষণ করা হয়, তা দূর করবে।

৮। বিকল্প প্রস্তাব

ভারতের দু' টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সমস্যাকে আমার মতে ভারতীয় মুসলিমদের যে দৃষ্টিভংগীতে দেখা উচিত, তা আমি সংক্ষেপে বিবৃত করবার চেষ্টা করেছি। সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে বৃটিশ ভারতের পুনর্বিভাগই হচ্ছে ভারতীয় মুসলিমদের প্রধান দাবী। অবশ্য সাম্প্রদায়িক সমস্যার আঞ্চলিক সমাধানের মুসলিম দাবী যদি উপেক্ষিত হয়, তাহলে সেরূপ ক্ষেত্রে আমি নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ ও নিখিল-ভারত মুসলিম সম্মেলন কর্তৃক বারংবার উত্থাপিত মুসলিম দাবীসমূহ সর্বাধিক সম্ভব জোরের সাথে সমর্থন করবো। ভারতীয় মুসলিমরা এমন কোনো সাংবিধানিক পরিবর্তনে সম্মতি দান করতে পারে না, যা পাঞ্জাব ও বাংলায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদের প্রাপ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার ব্যাহত করবে, অথবা কোনো কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাঁদের দাবী অনুযায়ী শতকরা ৩৩ ভাগ আসন সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি না দিতে পারবে। মুসলিম রাজনীতিকগণ দু' টি ব্যাপারে বিভ্রমে পতিত হয়েছিলেন তাঁর মধ্যে প্রথম হচ্ছে পরিত্যক্ত লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট; যার জন্ম হয়েছিলো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মিথ্যা ধারণার উপর এবং যা ভারতীয় মুসলিমগণকে ভারতের বুকে কোনোরূপ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করেছিল। দ্বিতীয় হচ্ছে তথাকথিত Punjab Ruralism এর খাতিরে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইসলামী সংহতিকে জলাঞ্জলি দেওয়া এবং তাঁর ফলে এমন একটি প্রস্তাবের উদ্ভব হয়েছে, যা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবের মুসলিম জনগণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। এখন মুসলিম লীগের কর্তব্য হচ্ছে উক্ত প্যাক্ট ও প্রস্তাব উভয়েরই নিন্দা করা।

সাইমন কমিশন পাঞ্জাব ও বাংলায় বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (Statutory Majority) সুপারিশ না করে মুসলিম জনগণের প্রতি বিরাট অবিচার করেছে। এটি মুসলিমদের লাক্ষৌ প্যাক্ট আঁকড়ে ধরা অথবা যুক্ত নির্বাচন পরিকল্পনায় সম্মত হবার দিকে ধাবিত করবে। সাইমন রিপোর্ট সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে স্বীকার করা হয়েছে যে, উক্ত দলিল প্রকাশের সময় থেকে মুসলিম সম্প্রদায় রিপোর্টে প্রস্তাবিত বিকল্প ব্যবস্থার কোনোটিই মেনে নিতে রাজী হয়নি। উক্ত সিদ্ধান্তে স্বীকার করা হয়েছে যে, দেশের অন্যত্র মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য তাঁদের সংখ্যানুপাত অপেক্ষা বেশী আসন দেওয়া হচ্ছে, কেবলমাত্র এই যুক্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলার কাউন্সিলে তাঁদের সংখ্যানুপাত অনুযায়ী প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করায় ন্যায়সংগত অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে সাইমন রিপোর্টের অবিচারের কোনো সংশোধন করা হয়নি। পাঞ্জাব সম্পর্কিত ব্যাপারে - এবং এটাই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার - পাঞ্জাব সরকারের সরকারী সদস্যবৃন্দ কর্তৃক তথাকথিত ‘Carefully Balanced Scheme’ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং তাতে সম্মিলিত হিন্দু ও শিখ সদস্যদের উপর পাঞ্জাবী মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া হয়েছে এবং মোটের উপর পরিষদে ৪৯% আসন পেয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, পাঞ্জাবের মুসলিমরা সমগ্র পরিষদ আসনসংখ্যার সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করে খুশী থাকতে পারে না। অবশ্য লর্ড আরউইন ও তাঁর সরকার স্বীকার করেন যে, যতক্ষণ না ভোটাধিকারের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্প্রদায়ের ভোটসংখ্যা নির্ভুলভাবে তাঁদের জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং যতক্ষণ না প্রাদেশিক কাউন্সিলের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের দাবী ত্যাগ করেন, ততক্ষণ তাদের সাম্প্রদায়িক নির্বাচন পদ্ধতির যৌক্তিকতা বিনষ্ট হবে না। আমি অবশ্য বুঝে উঠতে পারি না, কেন ভারত সরকার মুসলিমদের অনুযোগের যৌক্তিকতা স্বীকার করা সত্ত্বেও পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলিমদের জন্য বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার দিতে সাহস পাচ্ছেন না।

ভারতীয় মুসলিম জনগণ এমন কোনো পরিবর্তনেও সম্মতি দিতে পারে না, যাতে সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশ মর্যাদা দেওয়া না হবে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে নিম্নতর রাজনৈতিক মর্যদাসম্পন্ন প্রদেশ হিসাবে গণ্য করা হবে। সিন্ধুকে কেন বেলুচিস্তানের সাথে যুক্ত করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গড়ে তোলা হবে না, তার কারণ আমি বুঝে উঠতে পারি না। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাথে তার কোনো সাধারণ মিল নেই। জীবন পদ্ধতি ও সভ্যতার দিক দিয়ে রয়াল কমিশনের সদস্যগণ একে ভারতের চাইতে মেসোপটামিয়া ও আরবের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যযুক্ত দেখতে পেয়েছেন। মুসলিম ভুগোলবিদ মাসু' উদী দীর্ঘকাল আগে এই সম্পর্ক আবিষ্কার করে বলেছিলেন: "সিন্ধু ইসলাম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের নিকটবর্তী দেশ।" উমাইয়া বংশীয় প্রথম শাসক নাকি মিসর প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "মিসরের পিঠ রয়েছে আফ্রিকার দিকে ও মুখ রয়েছে আরবের দিকে।" প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ একই মন্তব্য সিন্ধুর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে ব্যক্ত করা যেতে পারে। তার পিঠ ভারতের দিকে ও মুখ মধ্য এশিয়ার দিকে রয়েছে। তার কৃষিসংক্রান্ত যেসব সমস্যা তা বোম্বাই সরকারের কোনো সহানুভূতি জাগাতে পারে না, তার প্রকৃতি বিবেচনা করলে এবং ভারতের মহানগরী হিসাবে করাচীর অবশ্যম্ভাবী বিবর্তনের উপর নির্ভরশীল অন্তহীন বাণিজ্য-সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবেচনা করলে তাকে এক প্রেসিডেন্সীর সাথে যুক্ত করে রাখা আমার মতে বিজ্ঞজনোচিত নয়। বর্তমানে উক্ত প্রেসিডেন্সীটি তার প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হলেও অদূর ভবিষ্যতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, আর্থিক অসুবিধার দরুন সিন্ধুকে পৃথককরণে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমি নির্দিষ্ট কোনো নির্ভরযোগ্য আলাপ দেখিনি। কিন্তু একটি প্রতিশ্রুতশীল প্রদেশের স্বাধীন অগ্রগতির সংগ্রামের পথে সরকার কেন সাময়িক অর্থ সাহায্য দেবে না, তা আমি বুঝে উঠতে পারি না।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কথা বলতে গেলে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক যে, রয়াল কমিশনের সদস্যবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে এই প্রদেশের জনগণকে কোনো প্রকার সংস্কারের অধিকার দান করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা ব্রে কমিটির (Bray Committee) চাইতে অনেকখানি পিছনে রয়েছেন এবং তারা যে কাউন্সিলের সুপারিশ করেছেন, তা হচ্ছে চীফ কমিশনারের স্বেচ্ছাতন্ত্রকে ঢাকা দেওয়ার আবরণমাত্র। আফগান জাতির সিগারেট ধরাবার সহজাত অধিকার খর্ব করা হয়েছে কেবলমাত্র এই যুক্তিতে যে, সে বারুদ ঘরে বাস করছে। রয়াল কমিশন সদস্যদের এই রসাল যুক্তিটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তা কারুর মনে আস্থা জন্মাবার মতো নয়। রাজনৈতিক সংস্কার হচ্ছে আলো, আগুন নয়; এবং প্রত্যেক মানুষেরই আছে আলোর অধিকার, তা সে বারুদের ঘরে বাস করুক, আর কয়লার খনিতেই বাস করুক। সাহসী, বিচক্ষণ ও ন্যায়সংগত অধিকার লাভের জন্য দুঃখবরণ করতে দৃঢ়সংকল্প আফগান নিশ্চিতরূপে তাঁকে আত্মবিকাশের সুযোগে বঞ্চিত করায় যে কোনো প্রচেষ্টার নিন্দা করবে। ইংল্যান্ড ও ভারত - উভয়ের স্বার্থের খাতিরে এমনি একটি জাতিকে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজন আছে। এই দুর্ভাগা প্রদেশে সম্প্রতি যা ঘটেছে, তা হচ্ছে ভারতের অবশিষ্টাংশে স্বায়ত্তশাসনের নীতি প্রবর্তন সত্ত্বেও এই প্রদেশের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের ফল। আমি কেবল এই আশাই পোষণ করি যে, এই প্রদেশের বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতি কোনরূপ বাইরের কারণ থেকে উদ্ভূত, এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করে বৃটিশ রাজনীতিকগণ যেনো প্রকৃত পরিস্থিতিত সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবকে আচ্ছন্ন না করেন।

ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য যে সংস্কার ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে, তাও সন্তোষজনক নয়। নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে সাইমন রিপোর্ট অপেক্ষা আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে এক ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক কাউন্সিল ও আধা-প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রিসভার সুপারিশ করা হয়েছে, কিন্তু তাতে এই গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম প্রদেশটিকে অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশের সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে ধরা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আফগান জাতি অপর যেকোনো ভারতীয় জাতি অপেক্ষা সহজাতভাবেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশি উপযোগী।

৯। গোলটেবিল সম্মেলন

আমার মনে হয়, এখন আমার গোল-টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদী নই। আশা করা গিয়েছিলো যে, সাম্প্রদায়িক কলহের বাস্তব ক্ষেত্র থেকে দূরে এক পরিবর্তিত পরিবেশে অধিকতর সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে এবং ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকার

অর্থে বিরোধ-মীমাংসার ফলে ভারতের মুক্তি নিকটতর হবে। প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহ অবশ্য গল্পের অবতারণা করেছে। প্রকৃতপক্ষে, লন্ডনে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্টভাবে বৃহৎ সাংস্কৃতিক ইউনিটসমূহের মধ্যকার অপরিহার্য বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টতঃ দেখতে চান না যে, ভারতের সমস্যা আন্তর্জাতিক, জাতীয় নয়। জানা গেছে, তিনি নাকি মন্তব্য করেছেন যে, "পৃথক নির্বাচন বজায় রাখার পক্ষে পার্লামেন্টের প্রস্তাব পেশ করা তার সরকারের পক্ষে কঠিন হবে, কারণ যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি বৃটিশ গণতান্ত্রিক মনোভাবের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।" স্পষ্টতঃ তিনি বুঝতে চান না যে, বৃটিশ গণতন্ত্রের আদর্শ একটি বহুজাতি অধ্যুষিত দেশের কোনো কাজে আসতে পারে না, এবং সমস্যাটির আঞ্চলিক সমাধানের জন্য পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি হচ্ছে নিছক মন্দের ভালো। সংখ্যালঘু সাব-কমিটির কোনো সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌঁছবার সম্ভাবনা নেই। সম্পূর্ণ প্রশ্নটি বৃটিশ পার্লামেন্টের সামনে পেশ করতে হবে; এবং আমরা কেবল এই আশাই করতে পারি যে, অধিকাংশ ভারতীয় রাজনীতিবিদদের চেয়ে ভিন্ন ধারায় জাতির তীক্ষ্ণদর্শী প্রতিনিধিবৃন্দ পরিস্থিতির অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ভারতের মতো একটি দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের মূল পন্থা নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন। একজাতিত্বের ভিত্তিযুক্ত ভারতের ধারণা নিয়ে শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদ রচনা করলে অথবা বৃটিশ গণতান্ত্রিক মনোভাবের নির্দেশিত নীতিসমূহ ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করল তা অজ্ঞাতসারে ভারতকে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হবে। আমি যতোটা দেখতে পাই, তাতে এদেশে ততোদিন কোনো শান্তি আসবে না, যতদিন না ভারতের বিভিন্ন জাতিকে হঠাৎ করেই তাঁদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন না করে তাদেরকে আধুনিক ধারায় অবাধ আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া হবে।

আমি একথা বলবার সুযোগ পেয়ে আনন্দ অনুভব করছি যে, আমি যাকে ভারতীয় আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে অভিহিত করি, আমাদের মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ তার সঠিক সমাধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে মীমাংসা হওয়ার পূর্বে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য চাপ দেওয়া তাদের জন্য সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। "সাম্প্রদায়িকতা" কথাটিতে যে খোঁচা রয়েছে তাতে কোনো মুসলিম রাজনীতিবিদের স্পর্শকাতর হওয়া উচিত হবে না। প্রধানমন্ত্রীর কথিত বৃটিশ গণতান্ত্রিক মনোভাবকে পুঁজি করে এবং ভারতে প্রকৃতপক্ষে যার অস্তিত্ব নেই এমন একটা পরিস্থিতি অনুমান করে ইংল্যান্ডকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এটি একটি প্রচারণা। আমাদের বিরাট স্বার্থ বিপন্ন হতে চলেছে। আমরা সংখ্যায় সাত কোটি এবং ভারতের যেকোনো জাতি অপেক্ষা আমরা বহুগুণে অধিকতর একজাতিত্ববোধসম্পন্ন। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মুসলিমরাই একমাত্র ভারতীয় জাতি যাদেরকে আধুনিক শাব্দিক তাৎপর্য অনুযায়ী সঠিকভাবে একটি জাতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। হিন্দুরা যদিও প্রায় সবদিক দিয়েই আমাদের তুলনায় অধিকতর অগ্রগামী, তথাপি তাঁরা একটি জাতির পক্ষে অপরিহার্য একজাতিত্ববোধ এখনো পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি, অথচ ইসলাম তা আপনাদেরকে তোহফা হিসাবে দান করেছে। নিঃসন্দেহে তাঁরা (হিন্দুরা) একটি জাতিতে পরিণত হবার জন্য আগ্রহান্বিত, কিন্তু একটি জাতিকে রূপায়ন করার বিবর্তনধারা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার এবং হিন্দু ভারতের ক্ষেত্রে এর জন্য তাঁদের সামাজিক কাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে।

তুরস্ক, ইরান ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহ জাতীয় অর্থাৎ আঞ্চলিক ধারায় প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে, এই সুক্ষ্ম কিন্তু বিভ্রান্তিকর যুক্তি দ্বারা মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিকদের বিভ্রান্ত হওয়া সংগত হবে না। ভারতীয় মুসলিম জনগণ সম্পূর্ণরূপে ভিন্নরূপ অবস্থায় অবস্থিত। ভারতের বাইরের ইসলামী দেশসমূহ জনসংখ্যার দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে মুসলিম। সেখানকার সংখ্যালঘু দলগুলো কুর'আনের ভাষায় আহলে কিতাব। মুসলিম ও আহলে কিতাবের মধ্যে কোনোরূপ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নেই। একজন ইহুদি অথবা একজন খৃষ্টান অথবা একজন জরস্থ্রুবাদীর স্পর্শে মুসলিমের খাবার অপবিত্র হয় না এবং ইসলামী কানুনে আহলে কিতাবের সাথে বিবাহের অনুমতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মানবতার চূড়ান্ত সংযোগ বিধানের জন্য সর্বপ্রথম যে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছিল, তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একই নৈতিক আদর্শ অনুসারী জাতিসমূহের অগ্রসর হয়ে মিলিত হবার আহবান জ্ঞাপন। কুর'আন শরীফে ঘোষণা হয়েছে: হে আহলে কিতাবগণ! এস, আমরা একত্র মিলিত হই সেই বাণীর (আল্লাহর একত্বের) উপর, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। [সূরা আলে-ইমরান: ৬৪] ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরণের ইউরোপীয় আগ্রাসন মুসলিম জাহানে এই আয়াতের অন্তহীন তাৎপর্যের বাস্তব রূপায়ন হতে দেয়নি। আজ ইসলামী দেশসমূহে মুসলিম জাতীয়তাবাদের (Muslim Nationalism) রূপে তা ক্রমেই উপলব্ধিতে আসছে।

আমার পক্ষে একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে, আমাদের প্রতিনিধিবর্গ দিল্লী প্রস্তাবে বিধৃত আমাদের দাবীসমূহ মেনে নিতে বৈঠকের অমুসলিম প্রতিনিধিবৃন্ধকে কতটা রাজি করাতে পারবেন তা হবে তাঁদের সাফল্যের একমাত্র পরীক্ষা। এই দাবীসমূহ স্বীকৃত না হলে জাতির সম্মুখে একটি অতি বড় সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হবে। তখনই ভারতীয় মুসলিমদের এক স্বাধীন ও সম্মিলিত রাজনৈতিক কর্মপন্থা অবলম্বনের মুহূর্ত সমাগত হবে। যদি আপনাদের আকাঙ্খা ও আদর্শ সম্পর্কে মোটেই আন্তরিকতা থাকে, তাহলে আপনাদেরকে অনুরূপ কর্মপন্থা অবলম্বনের জন্য তৈরী হতে হবে। আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যথেষ্ট রাজনৈতিক চিন্তা করেছেন এবং বর্তমানে যেসব শক্তি ভারতের ও ভারতের বাইরের জাতিসমূহের ভাগ্য রূপায়ন করছে, তাঁদের চিন্তাধারা নিশ্চিতরূপে আমাদেরকে সেসব সম্পর্কে কমবেশী সচেতন করে তুলেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে: অদূর ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতির

উদ্ভব হতে পারে, এসব চিন্তাধারা কি আমাদেরকে তদনুরূপ কর্মপন্থা অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত করেছে?

আমি আপনাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, বর্তমান সময়ে ভারতীয় মুসলিম দু'টি অনিষ্টকর অবস্থার ফল ভোগ করছে। প্রথমত হচ্ছে ব্যক্তিত্বের অভাব। স্যার ম্যালকম হেইলী ও লর্ড আরউইন সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে আমাদের ব্যাধি নিরূপন করে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বলেছিলেন যে, এই (মুসলিম) সম্প্রদায় নেতা জন্মাতে পারেনি। নেতা বলতে আমি সেইসসব লোককে বুঝি, যার খোদায়ী দান অথবা অভিজ্ঞতা দ্বারা ইসলামের প্রাণবস্তুত ও পরিণতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ অনুভূতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের লোকেরাই হচ্ছেন এক একটা জাতিকে পরিচালিত করার মতো শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু তাঁরা খোদার দান, ফরমাস মোতাবেক তাদেরকে তৈরী করা যায় না।

দ্বিতীয় যে অনিষ্টকর অবস্থার দরুন ভারতীয় মুসলিম জনগণ দুর্ভোগ, তা হচ্ছে এই যে, জাতি তার সহজাত ঐক্যের মনোভাব দ্রুতগতিতে হারিয়ে ফেলছে। এর ফলেই ব্যক্তি ও শ্রেণী বিশেষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে জাতির সাধারণ চিন্তাধারা ও কর্মকৌশলের ক্ষেত্রে কোন অবদান না রেখে স্বতন্ত্র পথে জীবন শুরু করা। আমরা ধর্মের ক্ষেত্রে শতাব্দী ধরে যা করে এসেছি, রাজনীতি ক্ষেত্রেও আজ ঠিক তাই করে যাচ্ছি। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে দলীয় কলহ আমাদের সংহতিকে ততবেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে না। অন্তত এটি মানুষের কাঠামোর একমাত্র মূলনীতিকে নির্মাণ করে এমন জিনিসের প্রতি আগ্রহ নির্দেশ করে। অধিকন্তু, এই নীতির এমন ব্যাপক ভিত্তিতে পরিকল্পিত হয়েছে যে, কোনো বিশেষ দলের পক্ষে এতটা বিদ্রোহী হওয়া প্রায় অসম্ভব, যাতে সে ইসলামের সাধারণ কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বোত্তম স্বার্থের খাতিরে যখন সম্মিলিত কার্যক্রম অবলম্বনের প্রয়োজন ঠিক সেই মুহূর্তে রাজনৈতিক কর্মপন্থার বৈচিত্র ধবংসাত্মক হতে পারে।

তাহলে কি করে আমরা এই দু'টি অনিষ্টকর অবস্থার প্রতিকার করব? প্রথম অনিষ্টকর অবস্থাটির প্রতিকার আমাদের আয়ত্বের মধ্যে নেই। দ্বিতীয় অনিষ্টকর অবস্থার কোনোরূপ প্রতিকার খুঁজে বের করা আমার কাছে সম্ভব বলে মনে হয়। এই বিষয় সম্পর্কে আমার সুনির্দিষ্ট মতামত রয়েছে; কিন্তু যে পরিস্থিতির আশংকা করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তার উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত তা প্রকাশ স্থগিত রাখাই আমি ভালো মনে করি। অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সকল মতানুসারী নেতৃস্থানীয় মুসলিমকে একত্রে সমবেত হতে হবে। কতগুলি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য নয়, বরং চূড়ান্তভাবে মুসলিম মনোভাব নির্ধারণের ও স্থায়ী সাফল্যের পথনির্দেশনার জন্য। এই অভিভাষণে আমি এই বিকল্প পন্থার উল্লেখমাত্র করছি, কারণ আশা করি, আপনারা কথাটি স্মরণ রাখবেন এবং ইতোমধ্যে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করবেন।

১০। উপসংহার

সুধীমণ্ডলী, আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি। উপসংহারে আমি আপনাদেরকে না জানিয়ে পারছি না যে, ভারত ইতিহাসের বর্তমান সংকট পরিস্থিতিতে মিল্লাত হিসাবে আপনাদের নিজস্ব স্বার্থের খাতিরে ও সমগ্রভাবে ভারতেরও স্বার্থের খাতিরে মুসলিম মিল্লাতের আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ভারতের রাজনৈতিক দাসত্ব সমগ্র এশিয়ার পক্ষে অন্তহীন দুর্দশার উৎস হয়ে রয়েছে। তার ফলে প্রাচ্যের সঞ্জীবনী-শক্তি হয়েছে দমিত এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করেছে আত্মবিকাশের আনন্দ থেকে, যে আত্মবিকাশের আনন্দ একদা তাকে এক মহান ও গৌরবময় তমদ্দুনের জন্মদাতা করে তুলেছিল। যেখানে আমাদেরকে বাঁচতে হবে ও মৃত্যুবরণ করতে হবে, সেই ভারতভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে। এশিয়ার প্রতি, বিশেষ করে মুসলিম এশিয়ার প্রতিও রয়েছে আমাদের কর্তব্য। যেহেতু মুসলিম এশিয়ার সবগুলি দেশের সম্মিলিত শক্তির তুলনায় একটি মাত্র দেশের সাত কোটি মুসলিম অধিবাসী ইসলামের জন্য অধিকতর মূল্যবান সম্পদ, সেই কারণে ভারতীয় সমস্যার প্রতি আমরা কেবল মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাকাবো না, বরং সে সমস্যাকে আমরা দেখবো ভারতীয় মুসলিমের দৃষ্টিকোণ থেকে। একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি সুসংহত আকাঙ্খা ব্যতীত এশিয়া ও ভারতের প্রতি আমাদের কর্তব্য আনুগত্য সহকারে সম্পন্ন করা সম্ভব হতে পারে না। ভারতের রাজনৈতিক সত্তাসমূহের অন্যতম রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে আপনাদের নিজস্ব স্বার্থের খাতিরে এই ধরনের প্রস্তুতি অপরিহার্য প্রয়োজন।

আমাদের বিশৃংখল অবস্থা ইতিপূর্বেই মিল্লাতের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। আন্ত-সাম্প্রদায়িক বোঝাপড়া সম্পর্কে আমি হতাশাবাদী নই, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে এই মনোভাব গোপন করতে পারি না যে, অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান সংকট পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মুসলিম মিল্লাতের পক্ষে স্বতন্ত্র কার্যক্রম অবলম্বনের প্রয়োজন আসতে পারে। অনুরূপ সংকট পরিস্থিতিতে স্বতন্ত্র ধারায় রাজনৈতিক কার্যক্রম অবলম্বন কেবল একটিমাত্র উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত একটি মাত্র আকাঙ্খাসম্পন্ন দৃঢ়-সংকল্প জাতির পক্ষেই সম্ভব হতে পারে। এক ঐক্যবদ্ধ আকাঙ্খার সুসংহত সামগ্রিকতায় পৌঁছা কি আপনাদের পক্ষে সম্ভব? হাঁ, নিশ্চয়ই সম্ভব। দলীয় স্বার্থ ও ব্যক্তিগত আকাঙ্খার উর্ধ্বে উঠুন; এবং আপনাদের ব্যক্তিগত ও

সমষ্টিগত কার্যকলাপ যতই বস্তুবাদী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হোক, আপনাদের অনুসৃত আদর্শের আলোকে তার মূল্য নির্ধারণ করতে শিখুন। বস্তু থেকে আত্মার দিকে ফিরে আসুন। বস্তু হচ্ছে বৈচিত্র্য, আত্মা হলো আলো, জীবন ও ঐক্য।

মুসলিম জাতির ইতিহাস থেকে একটি শিক্ষা আমি পেয়েছি। ইতিহাসের যে কোনো সংকট মুহূর্তে ইসলামই মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেছে, মুসলিম জাতি ইসলামকে রক্ষা করেনি। আজও যদি আপনারা ইসলামের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং ইসলামে মনোনীত চিরন্তন প্রাণসঞ্চারী ধারণা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করার চেষ্টা করেন, তাহলে তার ফলে আপনারা কেবল আপনাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকেই পুনরায় সুসংবদ্ধ করবেন, আপনাদের হারানো সততা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন এবং তা দ্বারা আপনারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবার বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন। কুর'আন মাজীদের একটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ আয়াত থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি যে, সমগ্র মানবতার জন্ম ও পুনর্জন্ম একটি মাত্র ব্যক্তির জন্ম ও পুনর্জন্মেরই অনুরূপ। জাতি হিসাবে আপনারা যখন মানবতার এই সুন্দরতম ধারণার সর্বপ্রথম বাস্তব অনুসারী হবার দাবীদার, তখন কেন আপনারা জাতি হিসাবে এক ব্যক্তির ন্যায় জীবনযাপন করতে ও একটি সত্তা হতে পারবেন না? আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে যেমন প্রতীয়মান হয় ভারতের পরিস্থিতি ঠিক তেমন নয় এমন মন্তব্য করে আমি কাউকে বিভ্রান্ত করতে চাই না। এর তাৎপর্য কেবল তখনই আপনাদের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে যখন তা দেখার মতো বাস্তব সমষ্টি-সত্তা (Real Collective Ego) আপনারা অর্জন করবেন। কুর'আন মাজীদের কথায়: নিজেদের আঁকড়ে ধর; যারা বিভ্রান্ত, তারা কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হও। [সূরা আল মায়েদাহ: ১০৫]

সূত্র: ইকবাল একাডেমি করাচী থেকে প্রকাশিত সৈয়দ আব্দুল মান্নান সম্পাদিত □পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা□ গ্রন্থ (সংশোধিত এবং পরিমার্জিত)

মুহাম্মদ ইকবাল

ইতিহাসের এক অশান্ত পরিবেশে ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ৯ নভেম্বর শুক্রবার ফজরের আযানের সময় বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট নগরীতে এক মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একতলা একটি জীর্ণ বাড়ির যে প্রকোষ্ঠে তার জন্ম তা এখনও পাকিস্তান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের জন্য এটি একটি দর্শনীয় বাড়ি। ইকবালের পূর্ব-পুরুষগণ কাশ্মীর থেকে হিজরত করে শিয়ালকোটে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ নূর মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন শিয়ালকোটের অন্যতম টুপি ব্যবসায়ী। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু ইকবাল মাওলানা গুলাম হাসান ও সৈয়দ মীর হাসানের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্কচ মিশন স্কুলের শিক্ষক সৈয়দ মীর হাসান মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনে খুব আগ্রহী ছিলেন। পিতা শেখ নূর মুহাম্মদের অনুমতিক্রমে ইকবালকে তিনি স্কচ মিশন স্কুলে ভর্তি করেছেন। প্রাথমিক স্তর থেকে এফএ পর্যন্ত দশ বছরকাল তিনি সৈয়দ মীর হাসানের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণ করেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সৈয়দ মীর হাসান অভিনব পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তরুণ ইকবালের মানে ঐকান্তিক পিপাসা জাগিয়ে তোলেন। ১৮৮৮ সালে প্রাথমিক, ১৮91 সালে মিডল এবং ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি ও মেডেলসহ উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ সালে ইকবাল ঐ কলেজ থেকে এফএ পাস করেন এবং একই বছর ১৮ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে লাহোর গমন করেন। লাহোর সরকারি কলেজ থেকে ১৮৯৭ সালে স্নাতক ও ১৮৯৯ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। একই বছর তিনি লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করেন।

১৯০১ সালে লাহের সরকারি কলেজে ইংরেজি ও দর্শন শাস্ত্রে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইংরেজি, আরবি ও দর্শনে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনকারী ইকবালের শিক্ষা জীবনে দ্বিতীয় শিক্ষক মীর হাসানের গভীর জ্ঞান এবং কলেজ জীবনে দর্শনের শিক্ষক টমাস আরনল্ড তার জীবনে প্রবল প্রভাব প্রতিফলিত করেন। টমাস আরনল্ডের উৎসাহে ১৯০৮ সালে যুক্তরাজ্যের Lincoln' s Inn থেকে ব্যারিস্টারী ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পাশাপাশি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। জার্মানী থেকে ১৯০৭ সালে দর্শনে পিএইচডি অর্জন করেন। ১৯১২ সালে এক নতুন ইকবাল স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তদানীন্তন বিশ্বপরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের অধঃপতনে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর থেকে ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যেও নেমে এসেছিল চরম দুর্দিন। সেই যুগসন্ধিক্ষণে যেসব তরুণ মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের সম্মুখ ভাগে ছিলেন আধুনিক বিশ্বে ইসলামের সময়োপযোগী ব্যাখ্যাকার, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের অগ্রসেনা, মানবতার মুক্তিকামী বিদ্রোহী কলম যুদ্ধের অকুতোভয় সৈনিক মহাকবি ইকবাল। ইকবাল তন্দ্রাচ্ছন্ন মুসলিম জাতিকে আমৃত্যু কাব্যের চাবুক মেরে জাগ্রত করার প্রয়াস পান। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এমন কোন দিক ছিল না, যে বিষয়ে তিনি তার মেধাকে ব্যবহার করেননি। কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, স্পেন, ইন্দোনেশিয়াসহ প্রতিটি রাষ্ট্রের সমস্যা নিয়েই তিনি দিক-নির্দেশনা সম্বলিত দরদমাখা কাব্য রচনা করেন। মুসলিম জাতি তাঁর কাব্যে ইতিহাস-ঐতিহ্য ও হৃত গৌরবের কথা স্মরণ করে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। তাদের সম্বিৎ ফিরে আসতে শুরু করে। ইকবাল নিছক কবি বা দার্শনিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দূরদর্শী রজনীতিকও। সবচেয়ে বড় কথা, ইকবাল ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী কবি, ভাবুক ও রাজনীতিক। গতানুগতিকতার সোজাপথ ছেড়ে যে কবি-দার্শনিক সম্পূর্ণ এক নতুন পথে এগিয়ে গেছেন, তিনিই হলেন মহাকবি আল্লামা ইকবাল। তিনি কাব্যকে করেছেন জাতি গঠনের হাতিয়ার। এই বিশাল ব্যক্তি উর্দু, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষায় মুসলিম উম্মাহকে যে পথের দিশা দিয়ে গেছেন, তা সম্পূর্ণ কুরআন, হাদিস, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের নির্যাস। তার রচনা সমগ্রে মিশে আছে ইসলাম। ইকবাল ' আর্ট ফর আর্টস সেক' -এ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্প জীবনের জন্য। আর সেজন্যই তিনি নির্জীব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবিতাকে ব্যবহার করেন।

তাঁর পদ্য গদ্য যেকোন রচনার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মুসলিম মিল্লাত, মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতি। তিনি মুসলিম বিশ্বকে এক প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমৃত্যু কলম সৈনিক হিসেবে সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। ইকবালের প্রত্যাশা ছিল, ইসলাম একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেই। একজন মহৎ মানবতাবাদী কবি হিসেবে যেমন রয়েছে তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, তেমনি ইসলামের অতি আধুনিক ব্যাখ্যাদাতা হিসেবেও তিনি সমান গৌরবের অধিকারী। কুরআনুল করীমের বিশাল প্রাঙ্গণ, হাদীস শরীফ এবং ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ছিল ইকবাল কাব্যের সারবস্তু। ইসলামকে তিনি একটি গতিহীন ধর্মের কতকগুলো সূত্র সর্বস্ব ব্যবস্থা পত্র মনে করতেন না। তাঁর কাছে ইসলাম ছিল এক প্রাণপ্রাচুর্য্য উন্নত জীবনের প্রতীক। ইকবালকে উর্দু ভাষার কবি বলা হলেও একই সঙ্গে তিনি উর্দু ও ফার্সি ভাষার কবি। ইকবালের ১1টি কাব্য গ্রন্থের মধ্যে ৮টি ফার্সি ভাষায় ও ৩টি উর্দু ভাষায় লিখিত। তাঁর কবিতা লেখার সময়কাল ১৯০৮ থেকে ১৯২৪ খৃস্টাব্দ। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগন্থ ' শিকওয়া' এবং ' জবাব-ই-শিকওয়া' । ১915 সালে আসরারে-ই-খুদী এবং ১৯১৮ সালে রমুয-ই-বেখুদী' প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ সালে ইকবালের ' জাবিদলামা' প্রকাশিত হয়। ফার্সি ভাষায় রচিত এই কাব্যগ্রন্থ কনিষ্ঠপুত্র জাবিদের নামে নামকরণ করেন তিনি।

আল্লামা ইকবালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ :ইলম আল ইক্তিউদ (The Science of Economics)- উর্দু ছন্দে (ca ১৯০১), Islam as an Ethical and Political Ideal- ইংরেজি (১৯০৮), The Development of Metaphysics in Persia- ইংরেজি (১৯০৮) (বাংলা অনুবাদ : প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান),আসরার ই খুদি (The Secrets of the Self)- ফার্সি (১৯১৫, রুমিজ ই বেখুদি (The Mysteries of Selflessness)- ফার্সি (১৯১৭), পয়গাম ই মাশরিক (The Message of the East)- ফার্সি (১৯২৩), বাং ই দারা (The Call of the Marching Bell)- উর্দু ও ফার্সি (১৯২৪), জুবুর ই আজাম (The Psalms of Persia)- ফার্সি (১৯২৭), The Reconstruction of Religious Thought in Islam- (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন) (১৯৩০), জাভেদ নামা (The Book of Eternity)- ফার্সি (১৯৩২), বাল ই জিবরাইল (The Gabriel' s Wings)- উর্দু ও ফার্সি (১৯৩৩), পাস ছে বায়াদ কারদ আই আকুওয়াম ই শারক (So What Should be Done O Oriental Nations)- ফার্সি (১৯৩৬)-, মুসাফির (The Wayfarer)- ফার্সি (১৯৩৬), জারব ই কালিম (The Blow of Moses) উর্দু ও ফার্সি (১৯৩৬)। আরমাঘান ই হিজাজ (The Gift for Hijaz)- ফার্সি ও উর্দু (১৯৩৮)।

আল্লামা ইকবালের জীবন ও কাব্যে জালাল উদ্দিন রুমির প্রভাব অত্যধিক। মিরাজ এ রসুল (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন জিবরাইল (আ:), আর ইকবালের ঊর্ধ্বলোকের সফরসঙ্গী মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইকবাল কেবলমাত্র কবিতা বা কাব্য লেখকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অতিউচ্চ মানের চিন্তাশীল প্রবন্ধ লেখকও। আল্লামা ইকবালের চিন্তার গভীরতার জন্যই ইকবালের কবিতা শুধু মুসলমানের জন্য নয়, গোটা বিশ্বমানব সমাজের জন্য হয়ে ওঠে নতুন চিন্তার দিকদর্শন। কেননা তিনি যে সংকট ও সমস্যার কথা চিন্তা করেছিলেন তা শুধু মুসলিম সমাজের নয়, বিশ্বসমাজের সমস্যা।

ইকবালের অসংখ্য কাব্য, প্রবন্ধের মধ্যে ' আসরার-ই-খুদী' কে বলা হয় ইকবালের শ্রেষ্ঠ রচনা ' Masterpiece' । ইকবাল ১৯০৮ সালে All India Muslim League-এর সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে পাঞ্জাবের লেজিসলেটিব কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৭-২৮ সালের ৫ মার্চ পাঞ্জাব আইনসভার বাজেট অধিবেশনে ভাষণ দেন। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত All Party Muslim Conference-এ ভাষণ এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র কার্যক্রম গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তিনি এলাহাবাদে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করেন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনের কারিগর হিসেবে দার্শনিকতার কাজ করে তাঁর চিন্তাগুলো। আল্লামা ইকবালের এক ছেলে ড. জাবেদ ইকবাল ও এক মেয়ে মুনীরা। তিনি ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল ভোর ৫টা ১৪ মিনিটে চতুর্দিকে ফজরের আযান ধ্বনির মধ্যে ৬০ বছরের কিছু উর্ধ্বে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।